মাঝে ক'দিন ছুটি, কলকাতায় কাজ, দু'একদিন অফিস। অফিস চলছে হেলেদুলে চাপ বিহীন, নিরুপদ্রোব অফিস। ঘাড় গুঁজে কাগজত্র দেখছে অন্বয়। বদলীর চিঠি এসেছে সদর অফিস থেকে। মনটা কেমন লাগছে। স্টাফেরাও যেন স্বজন হারাতে চলেছে।

কাঁচের ঘরে দলিল দাখিলের ফাঁকা জায়গা দিয়ে কেউ কাগজ দাখিল করতে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাগজ টাগজ কিছু একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ফাঁক দিয়ে। মাথা নিচু করে রেজিষ্ট্রারের চোখ তখনো টেবিলের ওপর রাখা চিঠিপত্রেই ওপর। মাথা তুলতেই দেখা গেল দাখিল করা হয়েছে পোস্ট অফিসের একটা বই, একটা কাগজের ঠোঙায় কিছু, যার বাইরে থেকে তেল ছাপ। সামনে দাঁড়িয়ে বনি জানা, মাথায় ঘোমটা, চামড়া কুচকে যাওয়া মুখে হালকা হাসি, লাজুক বৃদ্ধার ঠোটটা ঝুলে রয়েছে। আর গোল গোল চোখ গুলোতে কৃতজ্ঞতা।

রেজিষ্ট্রারের চোখে জল। কাঁচের ঘরের ভেতরে পিছনের দরজা দিয়ে ততক্ষণে ঢুকে গেছে অফিসের বেশ কয়েক জন স্টাফ। হয়ত কেউকেউ ভেবেছিল ট্রান্সফার অর্ডারে বাচ্চা অফিসারের ব্যথা লেগেছে আমাদের ছেড়ে যেতে। সামনে ওই বুড়ি, দাখিল করা পাশ বই আর খাবারের ঠোঙা দেখে বুঝতে বাকি থাকে না কারোই। ঠোঙার দিকে ইশারা করে অফিসের কর্মচারীদেরকে চোখ পাকিয়ে ঠোঁটের হাসি মিশিয়ে বুড়ি বলল—'এগুলো সোবু তারই'। তাপসের গলাও ভিজে গেছে, রেজিষ্ট্রার নিজেকে সামলাতে মাঝের আঙুলটা দিয়ে স্টাইল করে চোখের জল মুছে নেবার চেষ্টা করছে। চেয়ারের পেছনে থেকে চার পাঁচ জন স্টাফের মধ্যে থেকে তাপসের ধরে যাওয়া গলায় শোনা যাচ্ছে—স্যার, উদ্দেশ্য মহৎ হলে সব কিছুই সঠিক।

"স্বপ্ন-ঘুড়ি"

নির্মল চন্দ্র বর্মন

এ. ডি. এস. আর., ইটাহার

আমি কোন গল্পকার নই।

অথচ একটা গল্প খুব শীগ্‌গিরই লিখে ফেলতে হবে।

কেন যে আগ বাড়িয়ে বলতে গিয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম গল্প লেখাটা সেরকম কঠিন কিছু নয়।

অথচ এখন ভেবে ভেবে কোন কূল পাচ্ছি না।

না খাওয়া ভালো হচ্ছে, না ঘুম!

সারাদিন চোখে আমার শূন্য-দৃষ্টি।

শুধু গল্প খুঁজছি!

হঠাৎ তাকে পেয়ে গেলাম।

একটা গাছে। ঝুলছে।

এরকম আচমকা সমাধান পেয়ে যাব ভাবিনি।

যেন মেঘ চাইতেই জল।

একটা ঘুড়ি ঝুলছে। লেজটা তেড়ে-বেঁকে পত্‌পত্‌ করে দুলছে। নাক বরাবর ঝোলানো দড়ি থেকে পেন্ডুলামের মত ঘুড়িটা দুলছে। দোদুল্যমান ঘুড়ি। দুলছে আর ঘুরছে। নেশা লাগানো দৃশ্য। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে কাঠ শুকনো ঘুড়িটা দুলছে। প্রাণহীন। কিন্তু প্রাণের প্রতীক।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল করিনি। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

কাকু, ঘুড়িটা পেড়ে দাও না?

বছর বারোর হাড় জিরজিরে ছেলেটি ঘুড়িটির দিকে ডান হাতের তর্জনী আর আমার দিকে ইচ্ছে পুরণের স্বপ্ন নিয়ে সহাস্য তাকিয়ে।

দৃশ্যটাকে ভ্যানিশ করার ইচ্ছে ছিল না। আমার দার্শনিক ব্যুৎপত্তি উদ্‌গারক ঘুড়িটির প্রতি এহেন দাবিদার ছেলেটিকে আড়চোখে দেখে নিলাম। তার আগ্রহের কমতি নেই।

লাটাই-সুতো আছে? আমি বললাম। ছেলেটি এমন ভাবে তাকালো, যেন সে লাটাই-সুতোর নাম শোনে নি জীবনে।

রাগ চেপে রাখা দায় হল।

তবে ওটা দিয়ে কি করবি?

বেচারা থতমত খেয়ে একটু মিইয়ে গেল।

একটু দয়া হল আমার। আহা! লাটাই-সুতো কেনার পয়সাও নেই!

কিন্তু লাফা-লাফিই সার হ'ল আমার। শেষে চপ্পলের ফিতে ছেঁড়ায় খান্ত দিলাম। কিছুতেই ঘুড়িটির নাগাল পেলাম না।

বললাম—যা, বাড়ি থেকে আঁকসি নিয়ে পাড়বি।

তারপর বহুদিন ব্যাপারটা ভুলেই ছিলাম। ইদানিং বিকেলে আর ঠিকমত সময় পাই না। গল্প লেখার তাগিদও ফুরিয়ে গেছে। চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছি। কেন না, আগের চাকরিটা চলে গেছে। আগাম দারিদ্রের দুঃস্বপ্ন আমার রাতগুলোকে নিদ্রাহীন করে তুলেছে। মায়ের বাত, বাবার কাশিটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। প্রেমিকার ফোন সব সময় 'ব্যস্ত' শোনাচ্ছে। বন্ধুরা খেপাচ্ছে—ভালো আছিস, গ্রু।

মনটা ভালো নেই, তাই বেরিয়ে পড়লাম হাঁটতে। সকাল বিকাল নাকি হাঁটাহাঁটি করা ভালো। মনের ভেতর অবসাদ বাসা বাধতে পারে না। হাঁটতে হাঁটতে সেই মরা জিয়ল গাছটার কাছে এলাম। দেখি ঘুড়িটা তেমনই আছে। রংটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। লেজটা অর্ধেক ছিঁড়ে গেছে। মাঝে মাঝে ফুটো হয়েছে। কিন্তু সেই ভাবেই দুলছে।

হঠাৎ দেখি সেই ছেলেটি দৌড়ে আসছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে আমার কাছেই এলো।

বলল—ঘুড়িটা পেড়ো না।

বলেই সে আমার সামনে দাঁড়ালো। যেন যুদ্ধ করবে আমার সঙ্গে।

কেন? আমি বললাম।

আমি রোজ ঘুড়িটা দেখতে আসি। খুব ভালো লাগে।

তুমি কেন আর আসো না?

আস্তে আস্তে কেন যেন আমার ঘুড়িটাকে খুব ভালো লাগতে লাগলো। ধূসর মাটি, শুকনো মাঠ, নীল আকাশ। ঘুড়িটাই একমাত্র জীবন্ত-দুলছে! আমার ভাগ্যের মত! ভাবলাম—আসব, প্রতিদিন আসব। আমার ভাগ্যের সামনে প্রতিদিন একবার দাঁড়াবো।

ভয় কি?

ছেলেটিকে বললাম—ঘুড়িটি পারো নি কেন?

লাটাই-সুতো কেনার পয়সা নেই, তাই পারিনি। তার চে এখানে রোজ এসে দেখে যাই।

ভালো আইডিয়া! বলতেই হবে। ঘুড়ি নেই, লাটাই নেই, সুতোও নেই— অথচ ঘুড়ি ওড়ানো, দেখা দিব্বি চলছে। বেশ।

যদি অন্য কেউ পেড়ে নিয়ে যায়? আমি বললাম।

তুমি পাগল না কি? দেখো না ঘুড়িটার কী দশা হয়েছে। প্রথম প্রথম আমার ভয় করত। এখন আমি নিশ্চিন্ত! ছেলেটি কেমন প্রশান্ত হাসছে! ঘুড়িটার জীর্ণ দশা তার হতাশাকে দূর করে দিয়েছে।

এদিকে আমার জীবনটাও জীর্ণ দীর্ণ হয়ে আসছে প্রতিদিন। কোনদিকে কোন আশার আলো দেখছি না। বন্ধুরা সব মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। দুটো টিউশান পড়িয়ে কোন রকম বেঁচে আছি। বাবা-মায়ের চিকিৎসা দরকার, দরকার পথ্য। এসব ভাবাটাই যেন এখন আমার কাছে বিলাসিতা।

বহুদিন হল ঘুড়িটা দেখতে যাইনি। ভালো লাগে না। ঘুড়িটা যেন আমারই দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি হয়ে আমাকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। অসহ্য লাগে। বস্তুত, নিজের দারিদ্রতার এমন জুৎসই প্রতিচ্ছবি আমি আর কোথাও দেখিনি। মাঝে মাঝে মনে হত ঘুড়িটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আসি। কিন্তু উদ্যমটা তাড়াতাড়িই উবে যেত।

হঠাৎ, একদিন সংবাদ পত্রের পাতায় দেখি সেই ঘুড়িটার ছবি। হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে সেই ছেলেটি। ছবিটা আন্তর্জাতিক নিলামে সেরা দর পেয়েছে। কোন এক ফরাসী পর্যটকের ক্যামেরায় তোলা।

বিকেলে গেলাম সেই জিয়ল গাছটির দিকে। ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। ঘুড়িটা, না ঠিক এখন তাকে ঘুড়ি বলা যাবে না। ঘুড়ির কঙ্কাল। সেটা দুলছে। হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটা অলীক বল কাজ করল। প্রাণপণে লাফ দিয়ে ঘুড়ির কঙ্কালটাকে নামিয়ে আনলাম। আমার কষ্টার্জিত কিছু টাকা আর ঘুড়ির কাঠামোটা ছেলেটিকে দিয়ে বললাম।, রঙীন কাগজ কিনে লাগিয়ো। আর লাটাই সুতো কিনে নিও। ছেলেটি যেন হাতে চাঁদ পেল। একছুটে বাড়ির দিকে চলে গেল।

নতুন ঘুড়ির ছবি দেখতে পেলাম আকাশে। সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের দারিদ্রকে নিয়ে গর্ব করার কোন মানে হয় না। নতুন উদ্যমে কাজে লাগতে হবে। যাই হোক না কেন, জীবনটায় একটু রং দরকার।

ভ্রমণ

অতীত থেকে বর্তমান ভারত

প্রিয়া মুখার্জী

এ. ডি. এস. আর., কদম্বগাছী

কলকাতার দুর্গাপুজো সবসময়ই আমার কাছে খুব স্পেশাল, কোথাও সাবেকি পুজোর প্রচলন তো কোথাও থিম পুজোর হাতছানি। সুতরাং, পুজোতে কলকাতায় থাকতেই হবে, আবার বেড়াতে যাওয়াটাও সমান জরুরি। তাই, ছুটিটা একটু বড়ই নিতে হল। মানুষের জীবন একটাই, দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই তাই অবসর খুঁজে নিতে হয়। দীর্ঘ পথ, তাই পূর্বপরিচিত 'ডলফিন-ট্র্যাভেলস্'-এর সঙ্গেই যাত্রা-সূচী তৈরী করা হল।

আমরা যাত্রা শুরু করলাম ১৬ই অক্টোবর। এবারের গন্তব্য পশ্চিমভারত, মহারাষ্ট্র-গোয়া। পরের দিন প্রায় দুপুর দেড়টার সময় আমরা ভুসওয়ালে পৌঁছলাম। ভুসওয়াল থেকে প্রায় এক থেকে দেড়ঘন্টা বাসজার্নি করে জলগাঁওতে পৌঁছলাম, জলগাঁও থেকে ঔরঙ্গাবাদ আবার প্রায় ঘন্টা চারেকের জার্নি। এখানকার আবহাওয়া খুবই শুষ্ক-রোদ চড়া। ট্রেনজার্নির পর চারঘন্টা বাসজার্নি করা কষ্টকর, সুতরাং প্রথমদিন জলগাঁও শহরে রেষ্ট। পরেরদিন সকাল সাতটায় রওনা হলাম ঔরাঙ্গাবাদের পথে। উত্তর-দক্ষিণে পাহাড়ঘেরা এই শহর মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়কালে ঔরঙ্গাবাদে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্য শাসনকালে এই শহর রাজধানী শিরোপা অর্জন করে। ঔরাঙ্গাবাদ শহরে পৌছনোর পূর্বে যাত্রাপথেই আমাদের ভ্রমণের মূল আকর্ষণ—অজন্তা গুহা।

ঔরঙ্গাবাদ শহর থেকে প্রায় ১০৪ কিমি. দূরে অবস্থিত অজন্তা পরিচিত এর অপরূপ গুহাচিত্রের জন্য। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার উপর অশ্বক্ষুরাকৃতি পাহাড়ের উপর রয়েছে ত্রিশটি গুহা। প্রধানত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এই অমর শিল্পকলার স্রষ্টা। অজন্তার কাছাকাছি পৌঁছে চোখে পড়ল অন্য এক ধরণের স্থাপত্য, দূর থেকে দেখে মনে হয় টিন বা অ্যাসবেস্টসের তৈরী। গাইড জানাল এটি জাপান সরকারের তৈরী বৌদ্ধ-স্থাপত্য সংগ্রহশালা। বর্তমানে, এটি অসম্পূর্ণ, ভবিষ্যতে হয়তো পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। জলগাঁও থেকে ঔরাঙ্গাবাদ যাওয়ার পথে ২০ কিমি লিঙ্কিং রোড জাপান সরকার দ্বারা নির্মীত। অজন্তা গুহা প্রায় হাজার বছর ঘন বন-জঙ্গল ঢাকা পড়েছিল, ১৮১৯ সালে জন স্মিথ এটি আবিষ্কার করেন। দীর্ঘদিন ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত হয়ে থাকার কারণে বর্তমানে অজন্তার গুহাচিত্র অনেকাংশেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এখানে মোট ত্রিশটি গুহা বর্তমান। সবকটি গুহা এবং তার শিল্পকলা একই সময়ে সৃষ্টি হয়নি। এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন গুহা (১০নং গুহা) ৮ খ্রীঃ পূঃ -এ তৈরী এবং সবচেয়ে নবীন গুহাটি ৬ খ্রীস্টাব্দে তৈরী। অর্থাৎ গুহাগুলি প্রায় ১৫০০ বছর ধরে তৈরী হয়েছে। তাই, গুহাগুলির মধ্যে গঠনশৈলী এবং শিল্পকলার বৈচিত্র দেখা যায়। ত্রিশটি গুহার মধ্যে পনেরোটি গুহা সম্পূর্ণ এবং পনেরোটি গুহা অসম্পূর্ণ। গুহাগুলিকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়—মহাযান গুহা এবং হীনযান গুহা। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহাযানগোষ্ঠী ভগবান বুদ্ধকে সাকারে পূজা করে থাকেন। এই গুহাগুলি সাধারণত বিহারধর্মী অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের অবাসস্থল। ১, ২, ৪, ১৬, ১৭ নং গুহাগুলি এই ধরণের। এই গুহাগুলিতে ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রায় মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ৭ফুট × ৭ ফুট ঘরের মত অংশবিশেষ দেখা যায়। হীনযান গুহাগুলি মূলত চৈত্যধর্মী অর্থাৎ মন্দিরধর্মী। হীনযান ধর্মমত অনুসারে, এই ধরণের গুহাগুলিতে ভগবান বুদ্ধ প্রতীকধর্মী অর্থাৎ এখানে স্তুপ, পদ্ম, পিপুল গাছ ইত্যাদির প্রাধান্য দেখা যায়। ৯, ১০, ১৯, ২৬, ২৯ নং গুহাগুলি এই পর্যায়ের। প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিচার করলে ৯, ১০, ৮, ১২, ১৩ গুহাগুলি উল্লেখযোগ্য। অজন্তাগুহাগুলি শুধুমাত্র দেওয়ালচিত্রের জন্যই নয়, গুহার সিলিং এর ফুলের কাজ, মোটিফের কাজ,

উড়ন্ত ফিগার ইত্যাদি স্থাপত্যকার্য অসামান্য। এই গুহাগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এর স্থাপত্য তৈরী হয়েছে এক অনন্য উপায়ে অর্থাৎ উপর থেকে নীচে, ছাদের সিলিং-এর কাজ প্রথমে করা হয়েছে তারপরে দেওয়ালের কাজ। মুরাল পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে ১, ২, ১৬, ১৭, ১৯ নং গুহা উল্লেখযোগ্য। ১নং গুহার উপরে সিলিং-এ একটি ষাঁড়ের চিত্র রয়েছে। এটির বিশেষত্ব হল গুহার যেকোন প্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে এর উপর আলো ফেললে মনে হবে এটি যেন দর্শকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চোখদুটি এখনও অসম্ভব জীবন্ত। অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যের সাথে অসামান্য জ্যামিতিক জ্ঞানের সংমিশ্রণের স্বাক্ষর বহন করে এটি। এই ধরণের শিল্পকলার নিদর্শন আরও দেখা যায়, যেমন—চারটি হরিণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তাদের একটাই মাথা অথবা বৃত্তাকারে নৃত্যরত নর্তকীদের মধ্যে পাশাপাশি দণ্ডায়মান দুজনের হাত একটাই হাতের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। অজন্তাগুহার চিত্রকলাগুলি সবই পাথরের উপর, এতে ব্যবহৃত রঙ সবই প্রাকৃতিক। বিভিন্ন ধরণের রঙিন খনিজ পদার্থ চূর্ণ করে এই রঙ তৈরী করা হয়েছে যেমন—সাদা রঙের জন্য চুণাপাথর, লালের জন্য লেড অক্সাইড, হলুদের জন্য আয়রণ অক্সাইড, সবুজের জন্য জেড-পাথর, বেগুনীর ক্ষেত্রে ল্যাপিজ ল্যাজুলী ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাকৃতিক খনিজ রঙ ব্যবহারের কারণে প্রায় ১৫০০ বছর ধরে এই চিত্রকলা তখনও বর্তমান রয়েছে। সংরক্ষণের কারণে বর্তমানে এখানে যেকোন ধরণের আলোর প্রবেশ নিষেধ। অজন্তা গুহায় শুধুমাত্র চিত্রকলা নয়, স্থাপত্যশিল্পেরও অসাধারণ নিদর্শন মেলে। সেরা ভাস্কর্য দেখা যায় ১, ৪, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬ নম্বর গুহায়। মহাযান গুহাতে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি এবং হীনযান গুহাতে চৈত্যস্তুপের ভাস্কর্য অসাধারণ। ২৬ নম্বর গুহার গঠনশৈলী অন্য গুহাগুলির থেকে পৃথক। এখানে মহাযান গুহাগুলির মত বুদ্ধ মূর্তির দেখা মেলে এবং হীনযান গুহাগুলির মত বিশালাকার স্তুপ দেখা যায়। অজন্তার সব গুহা গাত্রেই জাতকের জীবনকাহিনী বণিত রয়েছে। এখানকার বোধিসত্ত্ব পদ্মপানি অবলোকিতশ্বরের ত্রিভঙ্গ মূর্তির চিত্রটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। মূর্তির মাথায় হীরা-মুক্তা খচিত মুকুট, মুখে বেদনার করুণাঘন প্রকাশ, অবনত দৃষ্টিতে করুণা ও বেদনা সীমাহীন। মূর্তিটি একটি তরুণ যুবকের শরীর নিয়ে চিত্রিত। মহাযান শাস্ত্র অনুযায়ী বোধিসত্ত্ব জগৎবাসীকে দুঃখ-কষ্ট থেকে ত্রাণ করার জন্য জন্ম নিয়েছেন। এই চিত্রে মনে হয় তিনি জাগতিক বেদনার অংশভাগী। শুধুমাত্র চিত্রকলা বা স্থাপত্যকলা নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও অজন্তগুহা অপরূপ। এর পাশের রয়েছে বাঘোরা প্রপাত যা পরবর্তীকালে বাঘোরা নদীতে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের তলায় রয়েছে সপ্তকুণ্ড। উপরের ভিউ পয়েন্ট থেকে সমগ্র অঞ্চলটি খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়।

দুপুরের আহারপর্ব সারা হল রাস্তার ধারের একটি ধাবায়। অজন্তার অসাধারণ চিত্রকলার সৌন্দর্য্যে আমরা তখন এতটাই বিমোহিত ছিলাম যে খাবারের দিকে মনোযোগ তখন প্রায় কারোরই ছিল না। আহার-পর্বের সমাপ্তির পরে আমাদের যাত্রা শুরু হল ঔরঙ্গাবাদের উদ্দেশ্যে। ঔরঙ্গাবাদ মূল শহরের খুব কাছেই আরেকটি দ্রষ্টব্য স্থান হল বিবি-কা-মকবরা। সুতরাং বিকালবেলায় আমরা পৌঁছে গেলাম সেখানে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সমাধিস্থল। এই পর্যটনক্ষেত্র মহারাষ্ট্রের তাজমহল নামে খ্যাত। আগ্রার তাজমহল মুঘল সম্রাট শাহজাহান তৈরী করেন তার প্রিয়তম পত্নী মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এরই অনুকরণে ঔরঙ্গজেব পুত্র আজমশাহ তাঁর দাক্ষিণাত্য শাসনকালে, মা বেগম রাবিয়া-উদ-দুরানির স্মৃতিতে এই সৌধটি নির্মার করেন। এখানে সম্পূর্ণভাবে তাজমহলকে অনুকরণ করা হয়েছে স্থাপত্য, প্রবেশপথ, বিস্তীর্ণ বাগান, সামনের জলাধারে সৌধের ছায়া সবকিছুতেই মূল সৌধের ছায়া অম্লান। বিকাল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যা নেমে এল, তা টেরই পেলাম না। বিবি কা মকবারা দেখে সন্ধ্যাবেলা আমরা ঔরঙ্গাবাদ মূল শহরে পৌছলাম। হোটেলে পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে, রাত নটাতেই চিকেন-সহযোগে ডিনার সেরে লম্বা নিদ্রাপর্ব, কারণ আগামীকাল—ইলোরা।

পরেরদিন সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে আমাদের যাত্রা শুরু হল। সকালের প্রথম গন্তব্য দৌলতাবাদ ফোর্ট। এই কেল্লার নির্মান করেন জনৈক যাদবরাজা। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল দেবগিরি। প্রায় কয়েকশো বছর ধরে এই কেল্লা সুলতানি শাসকদের কাছে অপরাজেয় ছিল। পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন খিলজি ১১০৬ খ্রীঃ কূটনৈতিক বুদ্ধি বলে এই কেল্লা জয় করেন। এই দূর্গ স্থাপত্য-শিএল্পর জন্য বিখ্যাত নয়, এর আকর্ষণ লুকিয়ে রয়েছে এর গঠনকার্যে। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার নিদর্শন এখানে লক্ষ্যণীয়। মূল দূর্গে প্রবেশের জন্য প্রাচীনকালে চারটি প্রবেশপথ ছিল। চারটি

প্রবেশপথ সম্পূর্ণ একইরকম দেখতে হলেও এর মধ্যে তিনটিই ছিল শত্রুসৈন্যকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে গঠিত। এগুলি দিয়ে কয়েক কিলোমিটার পথ শত্রুকে সামনে টেনে আনা হত, কিন্তু কোনভাবেই এপথ দিয়ে কেল্লায় পৌঁছনো যেত না। মূল প্রবেশদ্বারটি বর্তমানে পর্যটকদের জন্য খুলে রাখা হয়েছে। মূল প্রবেশদ্বারটি মসৃণ লোহার তৈরী তাতে মরচের চিহ্ন প্রায় দেখাই যায় না। মূল দ্বারের পাশে সেগুণ কাঠের উপর পিতলের কারুকার্য্য করা ছোট দরজা দেখা যায়, যার কাঠ এবং পিতলের উজ্জ্বল্য এখনো অম্লান। এর থেকেই বোঝা যায় তখনকার নির্মাণপদ্ধতি এবং সংরক্ষণপদ্ধতি কতটা বিজ্ঞানমনস্ক। মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার পরেও কেল্লায় পৌছনোর রাস্তা অত্যন্ত জটিল। দুর্গটি গভীর পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখা পার হয়ে ভুলভুলাইয়া। মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকেই রাস্তা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, একটি রাস্তা কেল্লায় পৌঁছয়, অন্যটি বহিরাগতদের বিভ্রান্তির উদ্দেশ্যে তৈরী। মূল দরজা থেকে পরবর্তী দরজার মাঝের দূরত্ব মাত্র ফুট, দরজার কাঠে কাঁটা বসানো। দূর থেকে ছুটে এসে হাতি দিয়ে দরজা যাতে ভেঙে ফেলতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা। জনশ্রুতি অনুযায়ী মূল কেল্লার বাইরের দেওয়াল এতটাই মসৃণ ছিল যে বাইরে থেকে কোনভাবেই এতে আরোহন করা যেত না। পরবর্তীকালে মহম্মদ-বিন-তুঘলক এই দূর্গকে কেন্দ্র করে দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। দেবগিরি নাম বদল করে রাখেন—দৌলতাবাদ, অর্থাৎ ধনরত্নের আবাসস্থল। কিন্তু, সমসাময়িক যুগোপযোগী বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতার জন্য তার এই প্রচেষ্টা বিফল হয়, পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হন।

দৌলতাবাদ ফোর্ট দেখার পালা শেষ করে আমরা এগিয়ে চললাম ইলোরার পথে। ঔরঙ্গাবাদ শহর থেকে এর দূরত্ব ২৮ কিমি। অজন্তা এবং ইলোরার ভৌগোলিক পরিবেশ প্রায় একই ধরণের—পাহাড়ি এলাকা, সবুজের সমারোহ এবং প্রাকৃতিক পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে, কিন্তু চাষের জমি এখান থেকে অনেক দূরে। অর্থাৎ প্রাচীন যুগের আবাসিকরা কৃষিকার্য্য ছাড়াও পৃথক কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সম্ভবত, তারা স্থানীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। ইলোরা এক বিস্ময়কর শিল্পকর্মের নিদর্শন—প্রায় দুই-কিলোমিটার বিস্তৃত অর্ধচন্দ্রকার পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে ৩৪টি গুহা নির্মাণকরা হয়েছে। দেব-দেবীর মূর্তি ছাড়াও এখানে খোদিত হয়েছে পশুপাখি, ফুল এবং অসংখ্য কারুকার্য্য—ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন-এই তিন ধর্মের সমন্বয় চোখে পড়ে। গুহাগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১-১২ নং গুহাগুলি দক্ষিণভাগের এবং ১৩-৩৪ নং গুহাগুলি উত্তরভাগের অন্তর্গত। দক্ষিণভাগের গুহাগুলি প্রধাণত বৌদ্ধগুহা। উত্তরভাগের গুহাগুলির মধ্যে প্রথম ষোলটি গুহায় হিন্দুধর্মের এবং ৩০ থেকে ৩৪ নং গুহায় জৈন ধর্মের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। প্রায় দুই-কিলোমিটার পাহাড়ী অঞ্চল জুড়ে গুহাগুলির অবস্থান খানিকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাই ছোট ছোট গাড়ি ভাড়া করে পুরো জায়গাটি ঘুরে দেখা সুবিধাজনক। আমরা শুরু করলাম উত্তরের গুহাগুলিকে দিয়ে। পাঁচ-ছয়টি করে গুহা একই জায়গায় রয়েছে। গুহাগুলি পশ্চিমমুখী হওয়ায় দুপুরের রোদ আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হল। এর মধ্যে ২১, ২৯, ৩২, ৩৩ নং গুহাগুলি উল্লেখযোগ্য। গুহাগুলির মধ্যে স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের গঠনশৈলীর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে অর্থাৎ গুহাগুলি সমসাময়িক নয়। ২১, ২৯ নং গুহাগুলিতে বিশালাকার স্থাপত্যের নিদর্শন মেলে। এগুলির ছাদ প্রধানত অনেকগুলি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২১ নং গুহার স্তম্ভের কারুকার্য্য অসাধারণ। এই দুই গুহাতেই আরাধ্য দেবতা শিব অর্থাৎ এগুলিকে হিন্দুগুহা বলা যেতে পারে। ৩২নং গুহাতে বৃহদাকার মহাবীর জৈনের মূতির দেখা মেলে। এটি একটি দ্বিতল গুহা। এর দ্বিতলের কারুকার্য শোভিত কালো পাথরের স্তম্ভ এবং সিড়ি এতটাই মসৃণ যে মনেই হয় না প্রায় পনেরোশো বছর আগে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে এটি তৈরী। অজন্তার মত এখানেও ছাদের দেওয়ালে রঙিন চিত্রকলার নিদর্শন মেলে, কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এছাড়া ৫, ১০, ১৫ নং গুহাগুলির ভাস্কর্য্য দর্শনীয়।

ইলোরার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুহা হল ১৬নং গুহাটি। এটি কৈলাস গুহা নামে বিখ্যাত। ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম কৃষ্ণের আমলে এই গুহামন্দিরের গঠনকার্য শুরু হয়। এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনোলিথিক স্থাপত্য—অর্থাৎ একটি মাত্র পাথরপাহাড় কেটে এটি তৈরী করা হয়েছে। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি কিংবা ঋজুরাহোর পশ্চিম অংশের মন্দির এই ধরণের স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলেও কৈলাস গুহামন্দিরের বিশাল আকারের সঙ্গে সূক্ষ্ম কারুকার্য একে

শ্রেষ্ঠতমের মর্যাদা প্রদান করেছে। প্রবেশপথের অংশ নন্দী প্যাভিলিয়ন নামে পরিচিত, তারপরেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গন—প্রাঙ্গণের মাঝে সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্বলিত মিনার এবং পাশে দ্বিতল প্যাভিলিয়ন। তিন লক্ষ্য কিউবিক টন পাথরের পাহাড় কেটে সমগ্র অংশটি তৈরী—পাহাড়ের চূড়া থেকে কাটা শুরু করে ক্রমশ নীচের অংশ তৈরী হয়েছে। মন্দিরের গায়ের ভাস্কর্যে নর-নারীর মূর্তি, ফুলের নক্সা, জন্তু-জানোয়ারের মূর্তির কাজ অতুলনীয়। স্থাপত্যের গঠনশৈলী এতটাই নিখুঁত যে দেখো মনে হয় বিশালকার অনেকগুলি হাতি মন্দিরটিকে বহন করে চলেছে। কৈলাস-দর্শন দিয়ে ইলোরা ভ্রমণ সমাপ্ত করে হোটেলে ফিরে এলাম, কিন্তু মন পড়ে রইল অন্য এক জগতে। বিস্ময়ের ঘোর তো সহজে কাটেনা। পাঠকদের অনুরোধ এই অসাধারণ সৃষ্টিকে তারা যেন অনুভব করেন।

পরের দিন সকাল আটটায় যাত্রা শুরু করলাম মহাবালেশ্বরের উদ্দেশ্যে—দূরত্ব প্রায় ৩৬৪ কিমি। অতীত ভারত ছেড়ে আমরা আধুনিক ভারতের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছলাম। স্বর্ণ-চতুর্ভুজ প্রকল্পের কল্যাণে ঔরঙ্গাবাদ থেকে পুণে ছয়-লেনের রাস্তা গড়ে উঠেছে যার ডানদিক বরাবর নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। আমরা ভুজওয়াল থেকে ঔরঙ্গাবাদ পর্যন্ত কালো মাটিতে তুলো মকাই এবং ভুট্টার চাষ দেখেছিলাম, এবার মতাই এবং আখের চাষজমি শুরু হল। ঔরঙ্গাবাদ থেকে পুনে ২৪০ কিমি রাস্তাটি অসাধারণ—সুন্দর, সুগঠিত। রাস্তার ডানদিকের অংশ উঁচু এবং টিলাজমি, রুক্ষ লালমাটি অঞ্চল— ব্যাপক বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে নতুন শিল্প স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এর প্রভাব বামদিকের কৃষিজমিতে পড়েনি। চোখে পড়ল প্রতিটি শিল্পসংস্থার স্থাপত্যে নীল রঙের ছোঁয়া রয়েছে, মনে হয় মহারাষ্ট্র সরকার এই প্রথাকে আবশ্যিক করেছে। এই ২৪০ কিমির মধ্যে ৬টি চেকপোস্ট আমরা পেয়েছি, অর্থাৎ প্রত্যেক ৪০ কিমি অন্তর একটি চেকপোস্টে আমাদের এন্ট্রি ফি জমা দিতে হয়েছে। মনেহয় PPP মডেলে এই রাস্তা প্রস্তুত হয়েছে, যা থেকে রাজ্য সরকার ও উদ্যোগপতি দুজনেই লাভবান হবে। এই অঞ্চলে জমি-মানুষ অনুপাত খুব উঁচু—অর্থাৎ জনবিস্ফোরণ এখনো হয়নি। মহারাষ্ট্রের সমৃদ্ধির এটা একটা কারণ। শহরাঞ্চলে এই চিত্রটি ঠিক বিপরীত। এখানকার গরু মহিষদের চেহারা বড়, শিং বিভিন্ন রঙের রঞ্জিত। পুনে শহর ছেড়ে ক্রমশ আমরা ঢুকে পড়লাম পাহাড়ী রাস্তায়—সবুজের সমারোহে। এখান থেকেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একাংশের সূচনা। দুপুরের আহার সারলাম রাস্তার ধারের ধাবায়, খুব খারাপ লাগল না—প্রায় ঘন্টা দুই বিশ্রাম নিলাম। রাস্তার ধারে হলুদের সমারোহ—চুনী গাঁদার সমারোহ, দেখে মনে হয় হলুদের চাষ করা হয়েছে। সবুজের সমারোহের মধ্যে দিয়ে বিকাল প্রায় ছয়-টার সময় যখন মহাবালেশ্বরে এসে পৌঁছলাম তখন শহর ঘুরে দেখার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কারোরই ছিল না, সুতরাং বাকি সময়টা হোটেলের ঘরেই রেস্ট। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মাঝে ছোট্ট এই হিলস্টেশনটি মহারাষ্ট্রের কাশ্মীর নামে পরিচিত।

পরেরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম প্রকৃতি দর্শনের জন্য। মহাবালেশ্বর শহরটি খুব সুপরিকল্পিত নয়, কিন্তু এখানে অপূর্ব সবুজের সমারোহ চারদিকে—এটাই দৃশ্যনীয়। এই শহর স্ট্রবেরীর শহর বলেই বিখ্যাত। এখানকার উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত স্ট্রবেরী চাষের পক্ষে আদর্শ। স্ট্রবেরী গাছ খুব বড় হয় না, এক একটি গাছে আটটি-দশটি করে স্ট্রবেরী ফলন হয়। সপ্তাহে দু-বার এই ফলন হয়। অম্ল-মিষ্ট লাল রঙের সুগন্ধী এই ফলটি মহাবালেশ্বরের প্রথম এবং প্রধান অর্থনৈতিক ভিত্তি। স্ট্রবেরী উদ্যানে আমরা তার আস্বাদন করলাম।

এই শহরকে কেন্দ্র করে কয়েকশো কিলোমিটার অঞ্চল সবুজ বনানী। বেশ কয়েক কিলোমিটার অরণ্য পথ মাড়িয়ে আমরা ইকো পয়েন্ট, নিডল্ হোল পয়েন্টে এসে পৌঁছলাম। একটা পাহাড়ের ধার ক্ষয়ে গিয়ে একটি নিডল্ সূঁচের গর্তের ন্যায় অংশ সৃষ্টি করেছে, এর অল্প দূরেই প্রাকৃতিক কারণে একটি পাহাড়ের আকৃতি হাতির শুঁড়ের রূপ ধারণ করেছে। এখানেই রয়েছে মহারাষ্ট্রের জলসম্পদের ভাণ্ডার। কৃষ্ণানদীর উপর নির্মিত সমস্ত বাঁধ এবং জলাধার এই অংশেই অবস্থিত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অধিকাংশ বৃষ্টিপাত এই অংশেই হয়। ভিউ পয়েন্ট থেকে সমস্ত অঞ্চলের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়—গভীর অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের খাত দিয়ে কৃষ্ণা নদী বয়ে চলেছে। ফেরার পথে আমরা লিঙ্গমালা ফলস্ দেখলাম। অনেকটা পাহাড়ী রাস্তা নীচে নেমে অরণ্যের মাঝে এই ঝর্ণাটি খুবই উপভোগ্য। পঞ্চগণি এবং লোনাভেলা শৈলবাসদুটি কাছেই অবস্থিত এবং সবুজ বনানী দ্বারা আচ্ছাদিত। পঞ্চগণির রাস্তায় অরণ্যপথে একটা মালভূমির উপর রয়েছে ভিউ পয়েন্ট এবং আর্থার চেয়ার —বসার স্থান হিসাবে জায়গাটি সত্যিই বিপজ্জনক, নীচে

খাড়াই পাহাড় প্রায় হাজার ফুট নেমে গিয়েছে। শোনা যায় বন্দীদের এখান থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হত শাস্তি হিসাবে। গাইড জানাল ছত্রপতি শিবাজী এই স্থান থেকে চারদিকের কয়েকশো কিলোমিটার অরণ্যভূমি এবং সমতলভূমির উপর নজর রাখতেন। ঠিক এর নীচেই রয়েছে প্রতাপগড় যাওয়ার ২৪ কিমি দীর্ঘ অরণ্য-পর্বত সঙ্কুল রাস্তা, ফলে মারাঠা-সেনানীর চোখ এড়িয়ে মোঘল সেনাদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। স্থানীয় মানুষের মতে এই পাহাড় থেকে কিছু ছুঁড়ে দিলে তা বাতাসে ভর করে আবার ফিরে আসে! জনৈক ব্রিটিশ সাহেব আর্থার সেই কথা প্রমাণ করতে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, বলাই বাহুল্য তিনি আর ফেরেন নি। ফেরার পথে আমরা ভার্ণা লেকে বোটিং করলাম। এই লেকটি অরণ্যময় পরিবেশে অবস্থিত এবং নৈনীতাল লেকের কথা মনে করিয়ে দেয়। দিনের শেষবেলায় আমরা **Sunset Point**-এ উপস্থিত হলাম। অরণ্যের মধ্যে হাঁটাপথে এগিয়ে, পথের পাথরের ধারে বসে সূর্যাস্তের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। উজ্জ্বল আলো আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ল, ক্রমেই সূর্য সহনীয় এবং কমলা রূপ ধারণ করল, প্রকৃতি এবং বনাঞ্চল পাখির কাকালিতে ভরে উঠল। গোধূলির লাল রঙের আলোয় প্রকৃতি ভরে উঠল। একটু পরেই সূর্যাস্ত হল। গাড়ির ড্রাইভার আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেছিল। এখানে দর্শকসংখ্যা খুবই অল্প ছিল—মাত্র আট-দশজন। সূর্যাস্তের তৎক্ষণাৎ পরেই হঠাৎই অন্ধকার নেমে এল। পরে জানতে পেরেছিলাম এই রাস্তায় সন্ধ্যের পর ভাল্লুক বের হয়। রাতটুকু পাহাড়ের উপর প্রবল ঠাণ্ডা। পরেরদিন সকালে যাত্রা শুরু করলাম গোয়ার উদ্দেশ্যে।

মহাবালেশ্বর থেকে পুনের দূরত্ব ১২৫ কিমি.। সকাল সাড়ে আটটায় শুরু করে তিন-সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে আমরা পুনে পৌঁছলাম, সেখান থেকে ট্রেনে গোয়া। ভারতের পঁচিশতম রাজ্যটি নৈসর্গিক দৃশ্য এবং রোম্যান্টিকতার জন্য বিখ্যাত। ছোট রাজ্য গোয়া ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পর্তুগীজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখনও এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, শহরের গঠনশৈলীতে বিদেশী প্রভাব বর্তমান। শহরের মূল অংশের বাইরে জনবসতি কম, প্রচুর গাছপালার সমারোহ। গোয়াকে ভালভাবে দেখার জন্য মোটামুটিভাবে দুইভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল—উত্তর গোয়া এবং দক্ষিণ গোয়া। পরেরদিন সকালে প্রথমেই রওনা হলাম মাণ্ডবী নদীর উদ্দেশ্যে। বেশ চওড়া নদী, নদীর তীরেই বন্দর। বন্দরে লাগানো জাহাজগুলি রঙিন আলো দিয়ে সাজানো, বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত রিভার ক্রুজে আনন্দ উপভোগ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ছবির মত সুন্দর রাস্তা শহর থেকে বেরিয়ে কখনো পাহাড়ী পথে বা কখনো সমতল জমি পেরিয়ে আমরা এসে পড়লাম ভ্যাগাটোর বিচে। পাহাড় এবং সমুদ্রের সহাবস্থানে অসাধারণ সুন্দর দর্শনীয় স্থান। এরপর একে একে আমরা ক্যালানগুটে, আনজুনা বিচে পৌঁছলাম। ক্যালানগুটে গোয়ার শ্রেষ্ঠতম বিচ—পাহাড় এবং সমুদ্র যেন এখানে এসে একে-অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। এটি গোয়ার শ্রেষ্ঠতম বিচ। আনুজনা বিচটি স্নানের উপযোগী —দীর্ঘ বালুভূমি ঝকঝকে পরিষ্কার, কোথাও খাবারের টুকরো, ফলের খোসা কিংবা প্লাস্টিক পড়ে নেই। এখানকার সমুদ্রের চরিত্র আমাদের চির-পরিচিত দীঘা বা পুরীর সমুদ্রের থেকে অনেকাংশে আলাদা। সমুদ্রের গভীরতা এবং জলের স্রোত অনেক বেশী, তীরের বালুভূমিতে শামুক, ঝিনুকের পরিমাণও খুব কম। বিচ-দর্শনের পর আমরা চলে এলাম আগুয়াড়া ফোর্টে। সমুদ্রের ধারে শহর গড়ে ওঠায় সমুদ্রের দিক থেকে বহির্শত্রুর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই তীরের অনতিদূরেই আগুয়াড়া ফোর্ট গঠন করে পর্তুগীজরা। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই দুর্গ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখা যেত। বর্তমানে একটি গোয়ার সেন্ট্রাল জেল। রোদের তাপ খুব বেশী থাকায় আমরা দুর্গের উপর ওঠা থেকে বিরত থাকলাম। বিকালবেলায় ফিরে এলাম মাণ্ডবী নদীর ধারে—সন্ধ্যাবেলায় এখানেই রিভার-ক্রুজ-এর আয়োজন করা হয়। আমাদের সুযোগ এল সন্ধ্যা সাতটায়। রঙিন আলো দিয়ে সাজান **'Sea Dawn'** আমাদের নিয়ে যাত্রা শুরু করল নদীর পথে। সময়সীমা একঘন্টা—যাত্রাপথ মাণ্ডবী নদীর তীর থেকে শুরু করে সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত। তীর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জন শুরু হলে গেল। গোয়ার মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে যেন সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ধরণের নৃত্য প্রদর্শিত হতে লাগল—কোঙ্কণি, গোয়ানিজ থেকে শুরু করে আধুনিক ডিস্কো পর্যন্ত। মোহনা পর্যন্ত গোটা জলপথে চোখে পড়ল রঙিন আলোকিত জাহাজ এবং ব্রীজ -এদের আলোয় নদীপথ আলোকিত হয়ে রয়েছে। সময়টা যে কখন কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না, যখন পুনরায় তীরে ফিরে এলাম তখনও মনের মধ্যে জেগে রইল মায়ারী কিছু মুহূর্ত, চোখে লেগে রইল বিস্ময়ের ঘোর। গোয়ার রাস্তায় সকাল থেকেই চোখে পড়েছে কাগজ ও

থার্মোকলের তৈরী রঙিন বিশালাকার দৈত্যমূর্তি। ফেরার পথে দেখলাম সেগুলি আলো দিয়ে সাজান হয়েছে। আজ কালিপুজোর আগের রাত, মূর্তিগুলির মধ্যে বাজি পুরে অগ্নিসংযোগ করে সারারাত ধরে আলো এবং শব্দের রোশনাই চলল। এই প্রথা অনেকাংশে আমাদের বাংলার ন্যাড়া-পোড়ানোর সঙ্গে তুলনীয়। পরের দিন দক্ষিণ গোয়া ট্যুর। পানাজি থেকে যাত্রা শুরু করে প্রথমেই পৌঁছলাম ওল্ড ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড কনভেন্ট অফ সেন্ট ফ্রান্সিস অসিসি চার্চে। এশিয়ার বৃহত্তম এই গির্জাটি ১৫১০-১২ খ্রীঃ নির্মিত। প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ১৬১৯ খ্রীঃ বর্তমান গীর্জাটি তৈরী করা হয়। এর দক্ষিণ টাওয়ারে ঝুলছে বিখ্যাত সোনালী ঘন্টা, যেটির শব্দ নাকি দশ কিমি দূর থেকেও শোনা যায়। ওল্ড ক্যাথিড্রালের বিপরীত অবস্থিত ব্যাসিলিকা অফ বম জেসাস। লাল ল্যাটেরাইটে গড়া এই গীর্জার ভিতরের মূল অংশের ভাস্কর্য সোনালী রঙের, দেখে মনে হবে বিদেশে এসে পড়েছি। ভিতরে সিলভার ক্যাসকেটে রাখা আছে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের মৃতদেহ। এখান থেকে আমরা পৌঁছে গেলাম ডোনা পাওলা-তে। অদ্ভুত নাম—মাণ্ডবী এবং জুয়ারী নদীর মাঝে ডোনা পাওলার উপসাগরের অবস্থান। পতুর্গীজ ভাইসরয়ের মেয়ে ডোনা এবং জেলের ছেলে পাওলা প্রেমের স্মারক হিসাবে যুগলমূর্তি রয়েছে টিলার উপর। উপরের ভিউ-পয়েন্ট থেকে গোটা উপসাগর এবং তার পাশে সবুজ বলয়ের সৌন্দর্য্য অসাধারণ লাগে। জল ছিটিয়ে, তীব্র গতিতে ওয়াটার স্কুটার নীল জলের বুক চিরে ছুটে চলেছে, তাতে চড়ার মত সাহস আমাদের হল না। সূর্যাস্তের সময় আমরা পৌঁছলাম মিরামার বিচে—নারকেল গাছের সারির পর বেশ খানিকটা ঝোপ-জঙ্গল, তারপরে সমুদ্র। এখানকার সমুদ্র স্নানের উপযোগী নয়, স্থানে স্থানে লাল পতাকা লাগানো অর্থাৎ গভীর সমুদ্রের সতর্কবার্তা, ধীরে ধীরে সূর্য সমুদ্রের কোলে ঢলে পড়ল। আজকের মত যাত্রাপর্ব সমাপ্ত করে ফিরে এলাম, পরের দিন আমাদের গন্তব্য মুম্বই। পরেরদিন সকালে প্রথমেই আমরা রওনা হলাম শ্রী মঙ্গেঁশ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। গোয়া প্রধানত খ্রীষ্টান রাজ্য হিসাবেই পরিচিত। পানাজি থেকে ২২ কিমি দূরে সবুজ পাহাড়ের মাঝে মনোরম গ্রাম পোণ্ডা, এটি একটি হিন্দু গ্রাম। বিখ্যাত মঙ্গেশকর পরিবার এই শিব-মন্দিরটির পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, তাদের নামানুসারে এটি মঙ্গেশ শিবমন্দির নামে পরিচিত। কোঙ্কানি শিল্পরীতিতে তৈরী এই মন্দির নির্জন এবং অপূর্ব সুন্দর। এরপর আমরা পৌঁচে গেলাম কোলবা বিচে। নারকেল গাছের সারির পাশে রূপালী বালুতটের পাড়ে আরব সাগরের সৌন্দর্য্য সত্যিই অসাধারণ লাগে। ককেয়ঘন্টা সমুদ্রসৈকতে কাটিয়ে আমরা মার্মাগাঁও স্টেশন থেকে রওনা হলাম মুম্বই-এর উদ্দেশ্যে।

আজকের ভারতের বাণিজ্য এবং শিল্পনগরী মুম্বই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এর কতকগুলি অন্তর্নিহিত কারণ আছে। মূল শহরগুলি বাদে রাজ্যের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা কম। ভ্যাট বাবদ এই রাজ্যের আয় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় তিনগুণের কাছাকাছি, রেজিষ্ট্রেশান এবং স্ট্যাম্প-ডিউটি বাবদ এই রাজ্যের আয় আমাদের তুলনায় বেশ কয়েকগুণ। এর কারণ হয়তো বোম্বে-হাই এর তৈল-শুল্ক এবং শিল্প থেকে অধিগৃহীত শিল্প। মুম্বইতে আমরা তিনদিন ছিলাম, একটা মিছিল-মিটিং চোখে পড়েনি—এর অর্থ অস্থিরতার পরিমান কম। মানুষ কর্মঠ এবং কর্মসংস্কৃতি বর্তমান। পুনা থেকে পানাজি পর্যন্ত অধিকাংশ পথটাই অরণ্য-আবৃত। আমার একটা অহংকার ছিল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির রাস্তা, চা-বাগিচা এবং অরণ্যসম্পদ সম্বন্ধে। কিন্তু এই ৬৭০ কিমি. রাস্তা এবং এখানকার সবুজ-সংরক্ষণের প্রচেষ্টা আমার সেই গর্ব ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার—এতবড় অরণ্যপথে একটা বেজি ছাড়া অন্য কোন বন্য প্রাণী চোখে পড়ল না, যদিও এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই নিরামিষভোজী। যাই হোক, এবারে মূল ভ্রমণসূচীতে ফেরা যাক।

কোঙ্কণ-কন্যা মেলে রাত কাটিয়ে পরেরদিন ভোর পাঁচটায় আমরা মুম্বই-ভিটি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। আজকের দিনটা হোটেলে রেস্ট। সুতরাং বিকালবেলায় নিজেরাই বেরিয়ে পড়লাম সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে—পৌঁছে গেলাম মেরিন-ড্রাইভে। সূর্যাস্তের পরে মেরিন-ড্রাইভে অর্ধচন্দ্রাকারে সমুদ্রকে ঘিরে আলো জ্বলে উঠল, মায়ানগরীর অপরূপ সৌন্দর্য্য আর একবার আমাদের মনে করিয়ে দিল তার ঐশ্বর্য্যের কথা। ফেরার পথে চলে এলাম ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাসে। মনে পড়ল কয়েক বছর আগের ধ্বংসাত্মক সেই রাতের কথা। মুম্বই—CST নামে পরিচিত এই স্টেশনটি ১৮০৮ খ্রীঃ গঠিত। ইন্দো-সারসেনিক গঠনশৈলীতে তৈরী মূল প্রবেশদ্বারটিতে প্রমাণ-মাপের

দুটি সিংহ খোদিত রয়েছে, যা দেখে মনে হয় সিংহ দুটি যেন দ্বাররক্ষীর ভূমিকায় চিরকালের জন্য নিয়োজিত রয়েছে। তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের জন্য জানাই এটি ভারতের অন্যতম ব্যস্ত রেলওয়ে স্টেশন, প্রতিদিন প্রায় ত্রিশ, লক্ষ যাত্রী অন্তশহর এবং শহরতলীর মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী প্রায় ১৩৫০ টি ট্রেনের মাধ্যমে যাতায়াত করে থাকেন। পরেরদিন সকালে মুম্বই সিটি-ট্যুরের উদ্দেশ্যে সদলবলে বেরিয়ে পড়লাম—সকালের প্রথম গন্তব্য সিদ্ধি বিনায়ক মন্দির। মহারাষ্ট্রের ধর্মস্থানের মধ্যে অন্যতম সেরা দ্রষ্টব্য একটি। লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীদের সঙ্গে আমরাও ঐশ্বর্য্যশালী এই মন্দিরে অষ্টবিনায়কের অন্যতম সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা করলাম। এখান থেকে আমরা চলে এলাম কমলা-নেহরু ন্যাশনাল পার্কে। সবুজ গাছগাছালিতে ভর্তি এই পার্কের ভিউ পয়েন্টটি অসাধারণ সুন্দর। এর বিপরীতে অবস্থিত ফিরোজ শাহ মেহতা গার্ডেন, যেটি হ্যাঙ্গিং গার্ডেন নামে পরিচিত—মালাবার হিলসের উপর অবস্থিত এই জলাধারটি উদ্যান আকারে সাজান। মুম্বই শহর প্রকৃতপক্ষে ফ্ল্যাট-নগরী, জনবসতির চাপ খুব বেশী, একক ব্যক্তিগত মালিকানায় সুদৃশ্য বাড়িঘরের দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। এরপর মূল শহর থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম ওরলি সি-ফেসে। মুম্বই শহর প্রধাণত সাতটি দ্বীপকে একত্রিত করে গড়ে উঠেছে। বান্দ্রা এবং ওরলির মাঝে সমুদ্রের উপর দিয়ে নির্মিত হয়েছে রাজীব-গান্ধী সেতু—এটি সি-লিঙ্ক বা লিঙ্করোড নামে পরিচিত। দুটি দ্বীপ-শহরের মাঝে সংযোগরক্ষাকারী এই সেতুটি মুম্বই-স্কাই-লাইনের এবং আধুনিক স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সারাদিন মুম্বই শহরে পরিদর্শনের পর বিকালবেলায় আমরা চলে এলাম জুহুবিচে। শহর থেকে দূরে জনপ্রিয় এই বিচ তখন লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে। বিচে সূর্যাস্ত দেখে তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম, কারণ পরেরদিন আমাদের যাত্রার অন্তিম লগ্ন—অনন্য সুন্দর অধুনিক এবং প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শণস্থান ভ্রমণ।

পরেরদিন সকাল ন-টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া-র সামনে। অ্যাপোলো বন্দরের সামনে নৌপথে মুম্বই-এর প্রবেশদ্বার এটি। ২৬ মিটার লম্বা ব্যাসাল্ট পাথরের তৈরী এই অসাধারণ স্থাপত্যটি পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনকালে ১৯১১খ্রীঃ নির্মিত হয়। এখান থেকে টিকিট কেটে আমরা রওনা হলাম এলিফ্যান্টার উদ্দেশ্যে, লঞ্চে করে আরবসাগরে পাড়ি দিলাম। পথে চোখে পড়ল ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিশালাকার যুদ্ধজাহাজ, কামান লাগানো নৌ-ঘাঁটি যেখান থেকে গোটা সমুদ্রপথের উপর নজরদারি করা যায়। সমুদ্রের আরেকদিকে গড়ে উঠছে নবী মুম্বই—নতুন শহর, যা ভবিষ্যতে মুম্বই শহরের পরিপূরক হয়ে উঠবে। তৈলজাহাজের জেটি পেরিয়ে আমরা সবুজ পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। অ্যাপোলো বন্দর থেকে ১১ কিমিঃ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলিফ্যান্টা গুহার প্রাচীন নাম ছিল ঘারাপুরি, পরবর্তীকালে পর্তুগীজরা একটি বিশালকার পাথরের মূর্তি এখানে আবিষ্কার করেন এবং সেই অনুসারে এই স্থানের নাম হয় এলিফ্যান্টা কেভস্। জেটি থেকে গুহা পর্যন্ত প্রায় ১-১$^{১}/_{২}$ কিমি পথ টয়ট্রেনে করে গুহায় গিয়ে পৌঁছলাম। ইলোরার মত এটিও গুহামন্দির, এর পূজিত দেবতা শিব। এখানে প্রধানত ছটি গুহা উল্লেখযোগ্য, অধিকাংশ গুহাই হিন্দুগুহা, তবে কিছু বৌদ্ধ এবং জৈন গুহাও রয়েছে। এলিফ্যান্টার ১নং গুহাটি সর্বাধিক জনপ্রিয় যেখানে ত্রিমুখের এক বিশালকার স্থাপত্যের দেখা মেলে। স্থাপত্যের আকার এবং গঠনশৈলী আবার একবার ইলোরার কথা মনে করিয়ে দিল। গুহামন্দির দেখার পর আমরা চলে এলাম ক্যানন হিলে, এখানে পাহাড়ের চূড়ায় দুটি বিশালকার কামান রয়েছে। এলিফ্যান্টা গুহা দর্শনের পরে আমরা পুনরায় লঞ্চে করে ফিরে গেলাম গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে। ফেরার পথে সমুদ্র থেকে দুটি ফাঁকা নল উঠে আসতে দেখলাম। সারেঙকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওটি ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপ। আমরা অনুরোধ করেছিলাম সাবমেরিনটা জল থেকে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য। কিন্তু নৌ-সেনাদের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সম্ভব হল না। গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার বিপরীতেই বিখ্যাত তাজ হোটেল, সুবিশাল এই হোটেলেরই একাংশের জ্বলন্ত ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। বর্তমানে মুম্বই তথা তাজ হোটেল পুনরায় তার স্ব-মহিমায় ফিরে এসেছে। রাত সাড়ে নটায় ট্রেন, রাতের খাবার স্টেশনে বসেই সেরে নিলাম। এবার ঘরে ফেরার পালা, কিন্তু ষোলদিনের ভ্রমণের আনন্দ মনের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখলাম যা কলকাতায় ফিরে নতুন করে কাজ করার এনার্জি যোগাবে।

বিচিত্রা

নেপোলিয়ন, কালোবিড়াল এবং অন্যান্য

শোভন মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর., ভগবানগোলা

নেপোলিয়ন আর কালো বিড়াল নিয়ে ইতিহাসে তেমন কোন শব্দ খরচ করা হয়নি। করার কথাও নয়। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন, কালো বিড়াল যাত্রাপথের সামনে দিয়ে গেলে নেপোলিয়ন সেই পথ পরিত্যাগ করতেন। মহান বীর নেপোলিয়নের এইরকম ভয়ার্তভাব আমাদের কাছে চরিত্র বিরোধী মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, জ্ঞানী গুণী-মূর্খ-শিক্ষিত-ভীতু-সাহসী নির্বিশেষে সবার মনে কোনো না কোনো ভাবে কুসংস্কার ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। তাকে সমাজের কোন একটি নির্দিষ্ট অংশের স্বভাব বলে সরলীকরণ করা যায় না। এই কুসংস্কারের উৎস সন্ধানে মানব সভ্যতার গোড়া ধরে নাড়া দিলে দেখব, আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন কুসংস্কারকে সযত্নে লালন পালন করেছে। কোনো কোনো কুসংস্কারের বয়স হয়তো হাজার হাজার বছর, কোনোটির হয়ত কয়েক দশক। কিছু কিছু কুসংস্কার আপাতদৃষ্টিতে কম ক্ষতিকারক বলে মনে হলেও বেশীরভাগই সমাজের পক্ষে চরম অনিষ্ঠকারক। এই কুসংস্কারের চরিত্র ও প্রকৃতি জানতে হলে প্রথমেই দরকার তার উৎস সন্ধান করা।

সিঁড়ি ঃ— সিঁড়ির নীচে দিয়ে পার হওয়াকে অনেকে দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করেন। এই কুসংস্কারের উৎস লুকিয়ে রয়েছে মধ্যযুগের ইংলণ্ডে । ইংলণ্ডের চরমতম শাস্তি ছিল ফাঁসি। অপরাধীকে সিঁড়ির নীচে দিয়ে একবার পার হয়ে তারপর সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠতে হতো। এর ফলে সিঁড়ির নীচে দিয়ে পার হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক হয়ে উঠলো।

নুন ঃ— রোমে খাওয়ার সময় নুন পড়ে যাওয়াকে অশুভ সংকেত মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা নুনকে আয়ের প্রতীক হিসাবে দেখতো। নুনের রোমান শব্দ Salium কথাটি থেকে Salary কথাটা এসেছে। তাই নুন পড়ে গেলে প্রতিকার স্বরূপ তারা ডান হাতে কিছু নুন দিয়ে বাঁ কাঁধের ওপর থেকে পিছনে ছুঁড়ে দিত। মনে করা হয় পিছনে কোন অশুভ শক্তি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এইভাবে হটিয়ে দেওয়া হল।

সংখ্যা 'তেরো' ঃ— সংখ্যাটিকে এখনও আমরা অশুভ বলে থাকি। কোন খেলোয়াড়ের জার্সি নাম্বার '১৩' সচরাচর দেখা যায়না। দু' হাজার বছর ধরে তা আমরা জ্ঞানে অজ্ঞানে মেনে আসছি। আসলে এটি খ্রীস্টান ধর্মের এক ধারনা। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর 'লাস্ট সাফার' বা অন্তিম ভোজে মোট তেরোজন বসেছিলেন। এবং সেই দিন ছিল শুক্রবার। তাই তেরো তারিখ যদি শুক্রবার হয় তবে তাকে চরম অশুভ বলে ধরা হয়।

সংখ্যা 'সাত' ঃ— তেরো সংখ্যাটি অশুভ হলেও 'সাত' সংখ্যাটিকে সবাই খুব শুভ বলে মনে করে। এর কারণ মানুষের ধারণা পৃথিবীতে সাতটি সমুদ্র, সাতটি আশ্চর্য ও আকাশের সাতটি নক্ষত্র রয়েছে।

আয়না ঃ— মধ্যযুগে মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখাকে আত্মা-দর্শন বলে মনে করত। সেই কারণে আয়না ভাঙলে মানুষ ভাবত তার আত্মা বুঝি নষ্ট হয়ে গেল। এর ফলে আগামী সাত বছরের মধ্যে যে কোন অশুভ শক্তি তাকে গ্রাস করতে পারে। আসলে তখন মানুষের ধারণা ছিল শরীরের কর্ষিকা নষ্ট হয়ে গেলে তা ঠিক হতে সাত বছর সময় লাগে। তাই সাত বছরের সময় সীমার কথা ভাবা হত। এখনও মানুষ ভাঙা আয়নাতে মুখ দেখতে চায়না ঠিক এই কারণে, এছাড়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব নড়ে গেলেও মানুষ ঠিক একই কারণে অস্থির হয়ে পড়ে।

সমুদ্র ঃ— সমুদ্র নিয়ে মানুষের কুসংস্কার দেখা যায় সভ্যতার শুরু থেকেই। সমুদ্র যাত্রায় মহিলাদের নিয়ে

যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তারা দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে বলে মনে করা হত। আবার হিন্দু শাস্ত্রে সমুদ্র যাত্রার আগে নারী দেবতা গঙ্গাকেই আরাধনা করা হয়। সমুদ্রপথে শিস্ দেওয়া উচিৎ নয় বলে বহুদিন ধরে এক ধারণা চলে আসছে। নাবিকরা মনে করত সমুদ্রের বাতাস যদি এই শিস্ এর প্রতিধ্বনি দেয় তা হলে তুফান আসতে পারে।

পেঁয়াজ-রসুন ঃ— পেঁয়াজ-রসুন উদ্ভিদ হলেও এদের আমিষ বলে ধরা হয়। মনে করা হত পেঁয়াজ-রসুন যৌন উত্তেজক। এই কারণে মধ্যযুগের পাদ্রীরা পেঁয়াজ-রসুন ঠোঁটেও ঠেকাতো না।

আংটি ঃ— আংটি বন্ধনের প্রতীক। আগে পাত্রীকে অপহরণ করে বিবাহ করা হত। এই আংটি সেই বন্ধনকেই প্রকাশ করে। সাধারণত আংটি পরা হয় বাঁহাতের চতুর্থ আঙুলে। আগে ধারনা ছিল এই আঙুলের একটি শিরা সরাসরি হার্টের সঙ্গে যুক্ত। এই কারনে চতুর্থ আঙুলে আংটি পরার রীতি চালু রয়েছে।

বিবাহ ঃ— বিবাহের বিভিন্ন নিয়মের সঙ্গে নানান সংস্কার যুক্ত রয়েছে। অনেক সমাজে বিবাহে চাল ফেলা হয়। এর কারণ সম্পত্তি ও শস্যের প্রাচুর্য বোঝানো হয়। এবং কনেকে প্রচুর সন্তান জন্মদানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

বিড়াল ঃ—ডাইনী প্রথার সাথে 'কালো বিড়াল' সংক্রান্ত কুসংস্কারটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৪৮৬ সালে দুই ইংলন্ডের পাদ্রী ঘোষণা করছিল যে, ডাইনী কালো বেড়ালের ছদ্মবেশে মানুষের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। এই কুসংস্কারটি ইংরেজদের সাম্রাজ্য জয়ের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দেশের সমাজেও প্রবেশ করে। আজও অনেকে কালো বিড়াল দেখলে কোথাও যাওয়া থেকে বিরত থাকে।

ডাইনী প্রথা ঃ— ডাইনী প্রথাটি আসলে মধ্যযুগীয় সবচেয়ে ক্ষতিকারক প্রথা। ইংলন্ডে এর উৎপত্তি হলেও বিশ্বের বেশীরভাগ আদিবাসী সমাজে এর ব্যাপক চর্চা দেখা যায়। ভারতে আজও ডাইনী সন্দেহে হত্যার খবর সংবাদপত্রের হেডলাইন হয়। গ্রামে কোন রোগের প্রকোপ দেখা দিলে সেই গ্রামের কোন মহিলাকে এর কারন হিসাবে ডাইনী আখ্যা দেওয়া হয়। আবার মেরেও ফেলা হয়। তবে এই কুসংস্কারের অন্তরালে অনেকসময় নানান কার্যসিদ্ধিও করা হয়। সমাজের কোন প্রভাশালী অংশ কোন পরিবারকে হেনস্থা করার জন্য বা প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই পরিবারের কোন মহিলাকে সুচতুরভাবে ডাইনী আখ্যা দিয়ে দেয়।

ডাইনীপ্রথা আসলে এই সভ্যসমাজব্যবস্থার সবচেয়ে বড় লজ্জা। মাঝে মাঝে ডাইনী সন্দেহে খুনের ঘটনা সংবাদপত্রে দেখা গেলেও আসলে এর সংখ্যাটি অনেক বেশী, যা অন্তরালেই থেকে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য, এই প্রথাটি মানুষের মনের গভীরে এমনভাবে চেপে রয়েছে যে, যারা এই হত্যায় যুক্ত থাকে তাদের কোন অনুতাপও থাকে না। কেবলমাত্র ঝাড়খণ্ডেই নয়ের দশকে ৫০০ মহিলাকে ডাইনী সন্দেহে খুন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

ঝাড়খণ্ডের এক প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্তা গুরু মারডি। তার ভাই মারা যায় যক্ষ্মা রোগে। গুরু তার চাচী নয়না মারডিকে ডাইনী সন্দেহ করে। দু'জনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকলেও কুসংস্কারের বশে গুরু তার চাচীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তার মাথা কেটে নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করে। পরে হাজতে থাকার সময় তাকে একবারও অনুতপ্ত মনে হয়নি। বরং চাচীর মৃত্যুতে তাকে বেশ নিশ্চিন্ত লাগছিল।

আসলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার এখনও আমাদের মনে রয়ে গিয়েছে। ১৪০০-১৬০০ অব্দের মধ্যে ইউরোপে ৪০,০০০ পুরুষ ও নারীকে খুন করা হয়। আজকের দিনে সংখ্যাটি এত না হলেও খুব একটা কমও নয়। আমরা নিজেদের যতটা প্রগতিশীল ভাবিনা কেন বহু যুক্তিহীন কাজকে অবলীলায় করে ফেলি। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার এই বিশ্বায়নের যুগে নতুন মোড়কে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হচ্ছে। 'ফেংশুই' কথাটার অর্থ 'হাওয়া' ও 'জল'। আসলে চীনের কৃষকদের কাছে এই দুটি জিনিসই খুব প্রয়োজনীয় ছিল। সেই থেকে ফেংশুই-এর জন্ম। এখন কিছু বিজ্ঞমানুষ (!) ঘরের ফুলদানিকে এদিক ওদিক করে ঘরের সৌভাগ্য(?) আনার চেষ্টা করেন। আর আমরা তার জন্য প্রচুর অর্থ

দিই। তাই কুসংস্কারকে কেবল আদিবাসী বা নিম্নশ্রেণীর মানুষের পেটেন্ট বললে ভুল হবে। আমরা যারা নিজেদের আধুনিক বলে দাবি করি তারাও বহন করে চলি কুসংস্কারকে।

বাদ নেই বিখ্যাত মানুষও। টেনিস তারকা বিয়র্ন বর্গ সৌভাগ্যের জন্য দাড়ি রাখতেন। বাস্কেটবলের কিংবদন্তী খেলোয়াড় মাইকেল জর্ডন প্যান্টের নীচে কলেজের স্পোর্টস প্যান্ট পরতেন। তিনি মনে করতেন এর ফলে জয় তার হাতের মুঠোয় আসবে। সম্রাট জুলিয়াস সীজার স্বপ্নকে ভয় পেতেন। শচীন তেন্ডুলকর থেকে সৌরভ গাঙ্গুলি—সবারই জার্সি নাম্বার নিয়ে খুঁতখুঁতানি রয়েছে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা নামের বানান ওলোটপালট করে সৌভাগ্য আমার চেষ্টা করেন।

এই সব ঘটনা নিয়ে চায়ের কাপে ঝড় তুললেও বিভিন্ন সমস্যায় আমাদের মত শিক্ষিত তথাকথিত আধুনিক মানুষও হাতে মুক্তা, হীরে পরে প্রতিকার খুঁজি। সে অর্থে আমাদের মানসিকতার কোন ভেদ নেই। বরং এই বিশ্বায়নের যুগে কুসংস্কারের বিশ্বায়ন হচ্ছে দ্রুত।

আসলে দরকার আত্ম-সমালোচনা। ডাইনী প্রথা নিয়ে ধিক্কার দেওয়ার আগে নিজেদের হাতের আংটিগুলি খুলে রাখতে হবে। রোজ ঘুম থেকে উঠে ঘরের কাগজে প্রথমে 'রাশি' দর্শনের স্বভাব পাল্টাতে হবে। তবেই অন্যের দিকে আঙুল তুলতে পারবো। আদিবাসীরা তো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, তাদের জীবন যে কুসংস্কারকে জড়িয়ে থাকবে এতে খুব স্বাভাবিকই। কিন্তু আমরা যারা নিজেদের শিক্ষা নিয়ে গর্ব করি তারা কেন নন্দজী, শাস্ত্রীজীর কাছে ছুটবো।

নেপোলিয়ন তো দু'শো বছর আগে জন্মেছিলেন। আমরা কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক!